জিলহজের প্রথম দশ দিনের ফযীলত এবং ঈদ ও কুরবানীর বিধান

فضل العشر من ذي الحجة وأحكام عيد الأضحى والأضحية

< بنغالي >

আব্দুল মালেক আল-কাসেম

عبد الملك القاسم

৪০৩

অনুবাদক: সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত এবং ঈদ ও কুরবানীর বিধান

জিলহজ মাসের দশ দিনের ফযীলত:

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু মৌসুম করে দিয়েছেন যেখানে তারা প্রচুর নেক আমল করার সুযোগ পায় যা তাদের দীর্ঘ জীবনে বারবার আসে আর যায়। এসব মৌসুমের সব চেয়ে বড় ও মহত্বপূর্ণ হচ্ছে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন।

জিলহজ মাসের ফযীলত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কতক দলীল:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَٱلۡفَجۡرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشۡرٖ ۝٢﴾ [الفجر: ١، ٢] "কসম ভোর বেলার। কসম দশ রাতের।" [সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ১-২]

ইবন কাসীর রহ. বলেছেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজ মাসের দশ দিন।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ﴾ [الحج: ٢٨] "তারা যেন নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করে।" [সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৮]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন: অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন।

৩. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দিনগুলোর তুলনায় কোনো আমল-ই অন্য কোনো সময় উত্তম নয়। তারা বলল: জিহাদও না? তিনি বললেন: জিহাদও না, তবে যে ব্যক্তি নিজের জানের শঙ্কা ও সম্পদ নিয়ে বের হয়েছে অতঃপর কিছু নিয়েই ফিরে আসে নি"।[১]

৪. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দশ দিনের তুলনায় অন্য কোনো দিন না আল্লাহর কাছে প্রিয়, আর না তাতে আমল করা প্রিয়। সুতরাং তাতে তোমরা বেশি করে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ কর"।[২]

৫. সা'ঈদ ইবন জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহর অভ্যাস ছিল, যিনি পূর্বে বর্ণিত ইবন আব্বাসের হাদীস বর্ণনা করেছেন: "যখন জিলহজ মাসের দশ দিন প্রবেশ করত তখন তিনি খুব মুজাহাদা অর্থাৎ এত বেশি বেশি ইবাদত করতেন, যেন তার চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা চালানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়"।[৩]

---

[1] সহীহ বুখারী

[2] তাবারানী ফিল মুজামিল কাবীর

[3] দারেমী, হাসান সনদে

৬. ইবন হাজার রহ. বলেছেন: জিলহজ মাসের দশ দিনের ফযিলতের তাৎপর্যের ক্ষেত্রে যা স্পষ্ট, তা হচ্ছে এখানে মূল ইবাদাতগুলোর সমন্বয় ঘটেছে। অর্থাৎ সালাত, সিয়াম, সাদকা ও হজ, যা অন্যান্য সময় আদায় করা হয় না।[৪]

৭. উলামায়ে কিরাম বলেছেন: জিলহজ মাসের দশ দিন সর্বোত্তম দিন আর রমযান মাসের দশ রাত, সব চেয়ে উত্তম রাত।

এ দিনগুলোতে যেসব আমল করা মুস্তাহাব:

১. সালাত: ফরয সালাতগুলো দেরী না করে সময়মত প্রথমেই সম্পাদন করা ও বেশি বেশি নফল আদায় করা। যেহেতু এগুলোই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার সর্বোত্তম মাধ্যম। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, তুমি বেশি বেশি সাজদা কর কারণ, তুমি এমন যে কোনো সাজদাই কর না কেন, আল্লাহ যার কারণে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা গুনাহ ক্ষমা করবেন"। (সহীহ মুসলিম) এটা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

২. সিয়াম : যেহেতু অন্যান্য নেক আমলের মধ্যে সিয়ামও অন্যতম তাই এ দিনগুলোতে খুব যত্নের সাথে সিয়াম পালন করা। হুনাইদা বিন খালেদ তার স্ত্রী থেকে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহজ মাসের নয় তারিখ, আশুরার দিন ও প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোযা পালন করতেন।[৫] ইমাম নববী জিলহজ মাসের শেষ দশ দিনের সাওমের ব্যাপারে বলেছেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব।

৩. তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ: পূর্বে ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার হাদীস বর্ণিত হয়েছে: তাতে রয়েছে, তোমরা বেশী বেশী তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পড়। ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, ইবন ওমর ও আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এ দশ দিন তাকবীর বলতে বলতে বাজারের জন্য বের হতেন, মানুষরাও তাদের দেখে দেখে তাকবীর বলত। তিনি আরো বলেছেন, ইবন ওমর মিনায় তাঁর তাঁবুতে তাকবীর বলতেন, মসজিদের লোকেরা তা শুনত অতঃপর তারা তাকবীর বলত এবং বাজারের লোকেরাও এক পর্যায়ে পুরো মিনা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দিনগুলোতে মিনায় তাকবীর বলতেন, প্রত্যেক সালাতের পর, বিছানায়, তাঁবুতে, মজলিসে ও চলার পথে। স্বশব্দে তাকবীর বলা মুস্তাহাব। যেহেতু উমার, ইবন উমার ও আবু হুরায়রা স্বশব্দে তাকবীর বলেছেন।

মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত এ সুন্নতগুলো জীবিত করা, যা বর্তমান যুগে প্রায় পরিত্যক্ত এবং ভুলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, এমনকি নেককার লোকদের থেকেও অথচ আমাদের পূর্বপুরুষগণ এমন ছিলেন না।

---

[4] ফাতহুল বারী

[5] ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ

৪. আরাফার দিন সাওম: হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য আরাফার দিনের সাওম খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তিনি আরাফার দিনের সাওমের ব্যাপারে বলেছেন: "আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তা পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে"।[6]

৫. নহরের দিন তথা দশই জিলহজের ফযীলত: এ দিনগুলোর ব্যাপারে অনেক মুসলিম-ই গাফেল অথচ অনেক আলেমদের নিকট নিঃশর্তভাবে এ দিনগুলো উত্তম; এমনকি আরাফার দিন থেকেও। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেছেন: আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম দিন হলো নহরের দিন। আর তা-ই হজ্জে আকবারের দিন। যেমন, সুনান আবু দাউদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় দিন হলো নহরের দিন, অতঃপর মিনায় অবস্থানের দিন।" অর্থাৎ এগারোতম দিন। কেউ কেউ বলেছেন: আরাফার দিন তার থেকে উত্তম। কারণ, সে দিনের সিয়াম দুই বছরের গুনাহের কাফ্ফারা। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন যে পরিমাণ লোক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন তা অন্য কোনো দিন করেন না। আরো এ জন্যও যে, আল্লাহ তা'আলা সে দিন বান্দার নিকটবর্তী হন এবং আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে ফিরিশতাদের সাথে গর্ব করেন। তবে প্রথম বক্তব্যই সঠিক: কারণ, হাদীস তারই প্রমাণ বহন করে, এর বিরোধী কিছু নেই। যাই হোক, উত্তম হয় আরাফার দিন হবে নয় তো মিনার দিন হবে, হাজী বা বাড়িতে অবস্থানকারী সবার উচিত সে দিনের ফযীলত অর্জন করা এবং তার মুর্হূতগুলো থেকে উপকৃত হওয়া।

ইবাদাতের মৌসুমগুলো আমরা কীভাবে গ্রহণ করব?

প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য ইবাদতের মৌসুমগুলোতে বেশি বেশি তাওবা করা। গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। কারণ, গুনাহ মানুষকে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখে। গুনাহ ব্যক্তির অন্তর ও আল্লাহর মাঝে বাঁধার সৃষ্টি করে। বান্দার আরো উচিত কল্যাণকর ও শুভ দিনগুলোতে এমন সব আমল ও কাজে নিয়োজিত থাকা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়। আর যে আল্লাহ র সাথে সত্যতার প্রমাণ দেবে আল্লাহও তার সাথে তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করবেন। তিনি বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩] "আর যারা আমাদের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্ট চালায়, তাদেরকে আমরা অবশ্যই আমাদের পথসমূহ দেখিয়ে দিব, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদের সাথে (জ্ঞানে ও সহায্য-সহযোগিতায়) রয়েছেন।" [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৬৯]

তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣﴾ [ال عمران: ١٣٣] "আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩]

হে মুসলিম ভাই, এ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর জন্য সজাগ থাক, তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ, তা যেন কোনো ভাবেই তোমার থেকে অবহেলায় অতিবাহিত না হয়। ফলে তুমি লজ্জিত হবে; কিন্তু তোমার লজ্জা সেদিন কোনো কাজে আসবে না। কারণ, দুনিয়া ছায়ার ন্যায়। আজকে আমরা কর্মস্থলে অবস্থান করছি আগামিকাল অবস্থান করব

[6] সহীহ মুসলিম

প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিবসে, জান্নাত কিংবা জাহান্নামে। তুমি তাদের মত হও, এ আয়াতে আল্লাহ যাদের উল্লখ করেছেন :

﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ﴾ [الانبياء: ٩٠] "তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাদেরকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত আর তারা ছিল আমাদের নিকট বিনয়ী। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৯০]

ঈদুল আজহার বিধান:

মুসলিম ভাই, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, তিনি তোমাকে দীর্ঘজীবি করেছেন যার ফলে তুমি আজকের এ দিনগুলোতে উপনীত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছ এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য ইবাদত ও নেক 'আমল করার সুযোগ পেয়েছ।

ঈদ এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য এবং দীনের একটি উজ্জল নিদর্শন। তোমার দায়িত্ব এটা গুরুত্ব ও সম্মানসহ গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢﴾ [الحج: ٣٢] "এটাই হলো আল্লার বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৩২]

ঈদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু আদব ও আহকাম:

১. তাকবীর: আরাফার দিনের ফজর থেকে শুরু করে তাশরীকের দিনের শেষ পর্যন্ত তথা জিলহজ মাসের তের তারিখের আসর পর্যন্ত তাকবীর বলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ﴾ [البقرة: ٢٠٣] "আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০৩]

তাকবীর বলার পদ্ধতি:

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد

আল্লাহর যিকির বুলন্দ ও সর্বত্র ব্যাপক করার নিয়তে পুরুষদের জন্য মসজিদে, বাজারে, বাড়িতে ও সালাতের পশ্চাতে উচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করা সুন্নত।

২. কুরবানী করা: ঈদের দিন ঈদের সালাতের পর কুরবানী করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح». "যে ব্যক্তি ঈদের আগে যবেহ করল, তার উচিত তার জায়গায় আরেকটি কুরবানী করা। আর যে এখনো কুরবানী করে নি, তার উচিত এখন কুরবানী করা"।[7]

কুরবানী করার সময় চার দিন। অর্থাৎ নহরের দিন এবং তার পরবর্তী তাশরীকের তিন দিন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

[7] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

«كل أيام التشريق ذبح». "তাশরীকের দিন কুরবানীর দিন"।[৪]

৩. পুরুষদের জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি মাখা: সুন্দর কাপড় পরিধান করা, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান না করা এবং কাপড়ের ক্ষেত্রে অপচয় না করা। দাঁড়ি না মুণ্ডানো, কারণ দাঁড়ি মুণ্ডানো হারাম। নারীদের জন্য ঈদগাহে যাওয়া বৈধ, তবে আতর ও সৌন্দর্য প্রদর্শন পরিহার করে। মুসলিম নারীদের জন্য কখনো শোভা পায় না যে, সে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তাঁরই গুনাহে লিপ্ত হয়ে ধর্মীয় কোনো ইবাদাতে অংশ গ্রহণ করবে। যেমন সৌন্দর্য প্রদর্শন, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি করে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া।

৪. কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করা: ঈদুল আযহার দিন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খেতেন না, যতক্ষণ না তিনি ঈদগাহ থেকে ফিরে আসতেন অতঃপর তিনি কুরবানী গোশত থেকে ভক্ষণ করতেন।

৫. সম্ভব হলে ঈদগাহে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া: ঈদগাহতেই সালাত আদায় করা সুন্নত। তবে বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে মসজিদে পড়া বৈধ, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পড়েছেন।

৬. মুসলিমদের সাথে সালাত আদায় করা এবং খুৎবায় অংশ গ্রহণ করা: উলামায়ে কিরামদের প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, ঈদের সালাত ওয়াজিব। এটাই ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢﴾ [الكوثر: ٢]

"অতএব, তোমরা রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর।" [সূরা আল-কাউসার, আয়াত: ২]

উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়া ঈদের সালাতের ওয়াজিব রহিত হবে না। মুসলিমদের সাথে নারীরাও ঈদের সালাতে উপস্থিত হবে। এমনকি ঋতুবতী নারী ও যুবতী মেয়েরা। তবে ঋতুবতী নারীরা ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করবে।

৭. রাস্তা পরিবর্তন করা: এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া ও অপর রাস্তা দিয়ে ঈদগাহ থেকে বাড়ি ফেরা মুস্তাহাব। যেহেতু তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

৮. ঈদের সুভেচ্ছা জানানো: ঈদের দিন একে অপরকে সুভেচ্ছা বিনিময় করা: যেমন বলা:

تقبل الله منا ومنكم. أو تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. "আল্লাহ আমাদের থেকে ও তোমাদের থেকে কবুল করুন, অথবা আল্লাহ আমাদের থেকে এবং তোমাদের থেকে নেক 'আমলসমূহ কবুল করুন।" বা এ ধরণের অন্য কিছু বলা।

এ দিনগুলোতে সাধারণভাবে ঘটে যাওয়া কিছু বিদ'আত ও ভুল ভ্রান্তি থেকে সকলের সতর্ক থাকা জরুরি:

১. সম্মিলিত তাকবীর বলা: এক আওয়াজে অথবা একজনের বলার পর সকলের সমস্বরে বলা থেকে বিরত থাকা।

২. ঈদের দিন হারাম জিনিসে লিপ্ত হওয়া: গান শোনা, ফিল্ম দেখা, বেগানা নারী-পুরুষের সাথে মেলামেশা করা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা।

৩. কুরবানী করার পূর্বে চুল, নখ ইত্যাদি কর্তন করা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী দাতাকে জিলহজ মাসের আরম্ভ থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

---

[৪] সহীহ হাদীস সমগ্র: ২৪৬৭

৪. অপচয় ও সীমালঙ্ঘন করা: এমন খরচ করা, যার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, যার কোনো ফায়দা নেই, আর না আছে যার কোনো উপকার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ [الانعام: ١٤١]

"আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।" [সূরা আর-আন'আম, আয়াত: ১৪১]

করবানীর বৈধতা ও তার কতক বিধান:

কুরবানীর অনুমোদনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন।

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر: ٢]

"অতএব, তোমরা রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর।" [সুরা আল-কাউসার, আয়াত: ২]

তিনি আরো বলেন:

﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦]

"আর কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি।" [সুরা আল-হজ, আয়াত: ৩৬]

কুরবানী সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সামর্থ থাকা সত্বে তা ত্যাগ করা মাকরুহ। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে, যা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন:

«أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরোতাজা ও শিং ওয়ালা দুটি মেষ নিজ হাতে যবেহ করেছেন এবং তিনি তাতে বিসমিল্লাহ ও তাকবীর বলেছেন।"

কুরবানীর পশু: উট, গরু-মহিষ ও বকরী-ছাগল-মেষ ছাড়া কুরবানী শুদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۗ﴾ [الحج: ٣٤]

"যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যেসমস্ত গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু তিনি রিযিক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। [সুরা আল-হজ, আয়াত: ৩৪]

কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য ত্রুটি মুক্ত পশু হওয়া জরুরী:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي».

"কুরবানীর পশুতে চারটি দোষ থাকা চলবে না: স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট অসুস্থ্য, হাড্ডিসার ও ল্যাংড়া পশু"।[9]

যবেহ করার সময়: ঈদের সালাতের পর কুরবানীর সময় শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[9] তিরমিযী, কিতাবুল হজ, হাদীস নং ৩৪

«من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب السنة». "যে সালাতের পূর্বে যবেহ করল, সে নিজের জন্য যবেহ করল। আর যে ঈদের সালাত ও খুতবার পর কুরবানী করল, সে তার কুরবানী ও সুন্নত পূর্ণ করল"।[10]

যে সুন্দর করে যবেহ করার ক্ষমতা রাখে তার উচিত নিজ হাতে কুরবানী করা। কুরবানীর সময় বলবে:

بسم الله والله أكبر، اللَّهُمَّ هذا عن فلان

কুরবানীকারী নিজের নাম বলবে অথবা যার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে তার নাম বলবে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«بسم الله والله أكبر، اللَّهُمَّ هذا عني وعن من لم يُضح من أمتي».

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার হে আল্লাহ, এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানী করে নি তাদের পক্ষ থেকে"।[11]

কুরবানীর গোস্ত বণ্টন করা: কুরবানী পেশকারী ব্যক্তির জন্য সুন্নত হচ্ছে কুরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া, আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের হাদিয়া দেওয়া এবং গরীবদের সদকা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]

"অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে তা থেকে দাও। [সুরা আল-হজ, আয়াত: ২৮]

তিনি আরো বলেন :

﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ﴾ [الحج: ٣٦]

"তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৩৬]

পূর্বসূরীদের অনেকের পছন্দ হচ্ছে, কুরবানীর গোশত তিনভাগে ভাগ করা: এক তৃতীয়াংশ নিজের জন্য রাখা, এক তৃতীয়াংশ ধনীদের হাদীয়া দেওয়া এবং এক তৃতীয়াংশ ফকীরদের জন্য সদকা করা। পারিশ্রমিক হিসেবে এখান থেকে কসাই বা মজদুরদের কোনো অংশ প্রদান করা যাবে না।

কুরবানী পেশকারী যা থেকে বিরত থাকবে: যখন কেউ কুরবানী পেশ করার ইচ্ছা করে আর জিলহজ মাস প্রবেশ করে, তার জন্য চুল, নখ অথবা চামড়ার কোনো অংশ কাটা হারাম, যতক্ষণ না কুরবানী করে। উম্মে সালমার হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه أحمد ومسلم وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي».

[10] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

[11] আবু দাউদ ও তিরমিযী

"যখন জিলহজ মাসের দশ দিন প্রবেশ করে এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে তখন থেকে চুল ও নখ কর্তন থেকে বিরত থাকবে। মুসনাদে আহমাদ ও মুসলিমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আর মুসলিমের অন্য শব্দে যা এসেছে তার অর্থ হচ্ছে, 'তাহলে সে যেন তার চুল ও শরীরের চামড়া থেকে কোনো কিছু কর্তন না করে যতক্ষণ না কুরবানী করছে।"

কুরবানী দাতার পরিবারের লোক জনের নখ, চুল ইত্যাদি কাঁটাতে কোনো সমস্যা নেই।

কোনো কুরবানীদাতা যদি তার চুল, নখ অথবা চামড়ার কোনো অংশ কেঁটে ফেলে, তার জন্য উচিত তাওবা করা, পুনরাবৃত্তি না করা তবে এ জন্য কোনো কাফ্ফারা নেই এবং এ জন্য কুরবানীতে কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি ভুলে অথবা না জানার কারণে অথবা অনিচ্ছাসত্বে কোনো চুল পড়ে যায়, তার কোনো গুনাহ হবে না। আর যদি সে কোনো কারণে তা করতে বাধ্য হয় তাও তার জন্য জায়েয এ জন্য তার কোনো কিছু প্রদান করতে হবে না। যেমন, নখ ভেঙ্গে গেল, ভাঙ্গা নখ তাকে কষ্ট দিচ্ছে, সে তা কর্তন করতে পারবে, তদ্রূপ কারো চুল বেশি লম্বা হয়ে চোখের উপর চলে আসছে, সেও চুল কাটতে পারবে অথবা কোনো চিকিৎসার জন্যও চুল ফেলতে পারবে।

মুসলিম ভাইদের প্রতি আহ্বান!

আপনারা উপরে বর্ণিত নেক 'আমল ছাড়াও অন্যান্য নেক 'আমলের প্রতি যত্নশীল হোন। যেমন, আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা, একে অপরকে মহব্বত করা এবং গরীব ও ফকীরদের উপর মেহেরবান হওয়া এবং তাদের আনন্দ দেওয়া ইত্যাদি।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে তাঁর পছন্দনীয় কথা, কাজ ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত